Issue cover not available

Vol. 13 | No. 2 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রকাব্যে উপমা ও প্রতীক

Volume	13
Issue	2
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ কবির
Published online	December 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i2.4
Pages	138-193
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রকাব্যে উপমা ও প্রতীক

আহমদ কবির

রবীন্দ্রকাব্যে ক্লাসিক ও বিবৃতিধর্মী উপমা

রবীন্দ্রনাথের উপমাগুলো সর্বাংশে রোমান্টিক কাব্যচেতনার প্রকাশক—এ কথা সত্য নয়। কিন্তু একথাও বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রতিভাবান রোমান্টিক গীতিকবি, সেখানে তাঁর উপমায় গতানুগতিক রূপচিত্রও কাম্য নয়। রবীন্দ্রনাথের উপমা বিচারেও একথাটি মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কিছু উপমা বিশ্লেষণধর্মী, ব্যাখ্যাযুক্ত, বিষয়কে স্পষ্ট করবার জন্যেই তৈরী। গদ্য কাব্যগুলোতে ভাব প্রধানতঃ আখ্যায়িকা প্রধান বলে ও সব কাব্যের উপমাতে অথবা ব্যাখ্যার ব্যাপারটা বেশী পাই। সন্দেহ নেই উপমা ব্যাখ্যারই প্রাধান্য দেয় প্রধাণতঃ, তবু রোমান্টিক উপমার বৈশিষ্ট্য তার ইঙ্গিতধর্মিতার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপমাগুলো ইঙ্গিতধর্মিতায় প্রোজ্জল। তাঁর বিবৃতিমূলক উপমাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্লেষণের অতিরিক্ত প্রাধান্য এবং এ কারণে এ গুলোর লক্ষ্য বক্তব্যবিষয়ের যথাযথ পরিস্ফুটন। 'বিদায়-অভিশাপ' 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি কাব্যনাট্য এবং 'কথা ও কাহিনী'র আখ্যানমূলক কবিতাগুলোতে এ জাতীয় উপমার প্রচুর সন্ধান রয়েছে। অবশ্য তাঁর প্রধান প্রধান গীতিকাব্যগুলোতেও বিবৃতি প্রধান উপমা আছে। মানসীর 'মেঘদূত' কবিতার উপমার কথাই ধরা যাক।

কালিদাসের মেঘদূত জগতের সমস্ত বিরহতাপিত প্রেমিক হৃদয়ের অশ্রুবাষ্প-ভরা প্রেমের বারতা দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে, এই প্রসঙ্গে কবির জিজ্ঞাসা,

তাদের সবার গান তোমার সংগীতে
পাঠায়ে কি দিলে কবি দিবসে নিশীতে
দেশ দেশান্তরে খুঁজি বিরহিনী প্রিয়া।
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।
পাষাণ শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন গগনচারী কাতরে নিশ্বাসী
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠান গগনে।

উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর প্রথম অংশে আছে কবির বক্তব্য, এ বক্তব্যকে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি দুটি উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। উপমার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের প্রশ্ন নয় এখানে—শুধুমাত্র বক্তব্যের পরিস্ফুটন ঘটছে কিনা তা দেখা দরকার। কল্পনার কোন সমৃদ্ধি নয়, ভবনার কোন অন্তর্গূঢ় ইঙ্গিত নয়, শুধু যথাযথের বিশ্লেষণ যথাযথ দিয়ে। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় ক্লাসিক উপমার রূপলক্ষণের মধ্যে মথাযথতাকেই মূর্ত করে তোলা হয়। উদ্ধৃত অংশে বর্ষার নদী যেভাবে সব স্রোতধারা টেনে নিয়ে মহাসাগরে মিলিত হতে চায় কিংবা যেভাবে বন্দী হিমাচল তার সহস্র কন্দর হতে বাষ্প পাঠায় গগনে, সেভাবে প্রেমিক হৃদয়ের বিরহগাথা বিরহিনী প্রিয়ার উদ্দেশ্যে দেশদেশান্তর ব্যাপ্ত হতে চলেছে—এই ভাবটি পরিষ্কার করে বোঝোনো হয়েছে। বিদায় কবিতাতে নিরুদ্দেশ যাত্রী

কবি চিহ্নহীন পথহীন অকূলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে কিভাবে হঠাৎ এক বিশেষ ক্ষণে আপন গতি রোধ করবেন তা বোঝানোর জন্য বিশ্লেষণধর্মী উপমার ব্যবহার হয়েছে,

অবশেষে
দাঁড়াইব দিবসের সর্বপ্রান্ত দেশে
এক মুহূর্তের তরে, সারাদিন ভেসে
মেঘখণ্ড যথা রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি।

একেবারে সুস্থির সুস্পষ্ট উপমা। কোথাও কল্পনার বাহুল্য নেই, চোখে দেখা অভিজ্ঞতার স্বরূপাশ্রয়ী, যদিও কিঞ্চিৎ আবেগপরায়নতা আছে। এ আবেগ-পরায়নতা রোমান্টিক কবির অন্তরোপলব্ধির স্বাভাবিক 'সংস্কার'। এদিক থেকে নিম্ন উপমাও উল্লেখযোগ্য,

যেমন পাখীর গান যেমন জলের তান
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা অরণ্যের শ্যামলতা
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
[পল্লীগ্রামে : চৈতালী]

পাখীর গান, জলের তান, প্রভাতের আলো, অরণ্যের কোমল শ্যামলতা, সবকিছুই ভালবাসার নিরুত্তাপ আবেগ-উপলব্ধিতে একিভূত হয়ে গেছে। তবুও এটি বিবৃতিধর্মী উপমা। এ জাতীয় উপমা রবীন্দ্রকাব্যে সংখ্যায় খুব কম নয় সম্ভবতঃ, এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রাচুর্য যখন এত বেশী তখন বিবৃতি এসে যাওয়াও স্বাভাবিক, সে জন্য রোমান্টিক গীতিচেতনার গভীরতম বন্ধনে ভাব ভাষা ও ছন্দের রূপ-প্রতিমা সব সময় আপন স্বরূপ নিতে

পারেনি। কবিভাবনা আত্মগত উপলব্ধিকে অতিক্রম করে কখনো কখনো ঘটনাকে আশ্রয় করেছে, আর সেখানেই উপমা ব্যখ্যানমূলক হয়ে গেছে।

'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলো প্রধানতঃ ঘটনাশ্রয়ী ও আখ্যানধর্মী, সে জন্যে উপমাও অনুরূপ। মহাকবি বাল্মীকি সৃষ্টিপ্রেরণার মহাপ্লাবীযন্ত্রণা বিবৃতির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে সুন্দর ও যথার্থভাবে—

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফেরে আপনার কূল উপকূল
তট অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডমরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়, সেই মতো বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্ত গতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মিকী কবি,—রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে
গভীর ক্ষলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ।

[ভাষা ও ছন্দ : কাহিনী]

এবং এই নব ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি বাল্মীকি নিজেই বলছেন,

মহাম্বুধি যেই মতো ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্য গীতে ঘিরে—
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে।

[ভাষা ছন্দ কাহিনী : কাহিনী]

নব ছন্দের আকাঙ্খিত ধ্বনিব্যঞ্জনা, ভাষাকে অঙ্গীকৃত করার প্রমত্ত শক্তির

উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে উপমাটিতে। তবে নতুন বিশ্লেষণের কোন ভাব নেই, উপমা নিজেই সব কথা বলে দেয়। 'সতী' কবিতায় আছে অমাবাঈ মুসলমান বীরকে স্বামী বলে মেনে নিয়ে কুলনাশিনী হয়েছে, আসলে তার বিয়ে হওয়ার ছিল জিবাজীর সাথে। বিয়ের আসর থেকেই মুসলমান বীর অমাবাঈকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং স্ত্রীর মর্যাদা দেয়, অমাবাঈও তাকে ভালোবাসে। জিবাজীর মৃত্যু হয়েছে সেই মুসলমান বীরের হাতে সংঘর্ষে, অবশ্য তাকেও ধৃত হতে হয়েছে। স্বামীর মুক্তি কামনার উদ্দেশ্যে পিতামাতার কাছে অমাবাঈয়ের আগমন ঘটলে পিতামাতা তাকে জিবাজীর স্ত্রী বলেই ঘোষণা করে এবং জিবাজীর চিতাশয্যায় আরোহণ করে তাকে সতী হতে বলে। পিতা বিনায়ক রাওয়ের মতে,

পরম পাবক
নির্মল উদার মৃত্যু—সকল পাতক
করে গ্রাস—সিন্ধু যথা সকল নদীর
সব পঙ্করাশি।

এবং,

পতিত কুসুমে লয়ে পঙ্ক ধুয়ে তার
গঙ্গা যথা দেয় তারে পূজা-উপহার
সাগরের পদে।

উপমা দুটিই যেন কলঙ্কিনী অমাবাঈয়ের পরিশুদ্ধির পথ করে দেয়। লক্ষণীয় ভাষা ও ছন্দের উপমার মতো এখানে ব্যাখ্যার অতিরিক্ততা নেই, কবি স্বল্পবাক হয়েছেন এখানে। এ শ্রেণীর উপমাই ক্লাসিক উপমার সত্যিকারের রূপ। 'নরকবাস' কবিতায় প্রেতগণ সদ্য নরকভোগরত রাজা সোমককে বলে,

পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখানে জড়ায়ে আছে তোমার শরীর
সদ্যচ্ছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।

উপমাটি ব্যাখ্যানমূলক হলেও খুবই সুন্দর, ভাব ট্রাজিক অনুভূতিসঞ্জাত। বহুপুত্র লাভের আশায় একমাত্র পুত্রকে পুরোহিত ঋত্বিকের পরামর্শে নর-মেধযজ্ঞে আহুতি দিয়ে পিতা সোমক নিজেকে পাপমুক্ত মনে করতে পারলেন না। স্নেহশীল পিতা স্মৃতিচারণ করে বলেন,

মোর বৃন্তভরি
একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি
ছিল সে জীবন মোর। আমার হৃদয়
ছিল তারি মুখ পরে—সূর্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে। হিমবিন্দুটিরে
পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে
সেই মতো রেখেছিনু তারে।

পুত্রকে হারাবার আশঙ্কা পদ্মপাতায় জলের মতোই টলমল, সেজন্য তাকে সবদিক থেকে আগলিয়ে রাখার সযত্ন প্রয়াস। 'গান্ধারীর আবেদনে' পাণ্ডব-বিরোধী দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের উক্তির প্রত্যুত্তর করছে,

পিত, সুখে ছিনু যবে
একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডব কৌরবে
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।

নিজেদের সম্বন্ধে এই উপমাত্মক বিশ্লেষণ বড় বেশী বিক্ষুব্ধতার পরিচায়ক এবং আসন্ন কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের একটি ইঙ্গিতও বটে। কিন্তু কর্ণের মনে ভক্তিশ্রদ্ধার স্বাভাবিক বিনম্রতা আছে। কুন্তির প্রতি তার উক্তি,

দেবী, তব নত-নেত্র-কিরণ-সম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্য করঘাতে
শৈল তুষারের মতো। [কর্ণকুন্তি সংবাদ]

'কথা ও কাহিনী'র প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাতে এই জাতীয় উপমা রয়েছে। ব্যাখ্যা হিসেবে উপমাগুলো সুপ্রযুক্ত এবং স্বচ্ছন্দ কবিকল্পনার উত্তম রূপায়ণিকও বটে। লক্ষণীয় এইসব উপমার প্রত্যেকটির মধ্যে একটি স্বাভাবিক চিত্র, বিশেষতঃ প্রকৃতির চিত্র, আমরা পাই।

ঠিক একই পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য দুটো চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপের উপমা-বিশ্লেষণ চলতে পারে। ভাব যদিও আখ্যায়িকাধর্মী, আবেগতীব্রতার দিক থেকে, কাব্যিক ব্যঞ্জনার সুকৌমার্যের দিক থেকে কাব্য দুটি 'কথা ও কাহিনীর' কবিতার চেয়ে দৃঢ়বদ্ধ রূপময়। উপমার মধ্যে কিন্তু ব্যাখ্যানধর্মিতারই প্রশ্রয়। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে পুরুষবেশধারী চিত্রাঙ্গদা অরণ্যবীথিমূলে শায়িত 'চিরধারী মলিন পুরুষ' অর্জুনকে ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে যখন তাড়না করলো, তখন,

সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তে তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার, ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে।

অর্জুনের উত্থানকার্যে উচ্ছ্রিত কাঠিন্যের প্রকাশক উপমাটি। আরেক জায়গায় আছে, মদনের কাছে রূপবর পাওয়া চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্যে অর্জুন বিমোহিত, তার উপলব্ধি 'কাহারে হেরিনু! সে কি সত্য কিম্বা মায়া!' রূপমুগ্ধ অর্জুন বলে,

উষার কনকমেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায় পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে।

এই উপমা নিঃসন্দেহে কবিকল্পনার উচ্চকিত ভাবব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। এমন সুষম চিত্রধর্মী উপমা 'চিত্রাঙ্গদা'তে আর একটিও নেই। এখানে চিত্রের রূপগত ও গুণগত উভয় বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত। সন্দেহ নেই ওই উপমা প্রধানতঃ বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত, কিন্তু বুঝিয়ে শুধু এর কাজ ফুরোয় না, স্মৃতি ও সঙ্গীতের আবেগ সৃষ্টি করে। কালিদাসের চিত্রধর্মী উপমার মতো এই উপমাও ঐশ্বর্যময়, কিন্তু ঐ 'সুখাবেশে' কথাটির জন্যে উপমাটির স্বাদ আলাদা এবং তা প্রকৃত হৃদয়ানুভূতির স্মারক।

'বিদায় অভিশাপে'র উপমাও বিবৃতি বা ব্যাখ্যকে আশ্রয় করেছে মূলতঃ। সহস্র বৎসর সাধনার শেষে কচ দেবযানীর কাছে হাসি মুখে প্রসন্ন বিদায় নিতে গেলে দেবযানী বলে,

হায় সখা এ তো সর্গপুরী নয়
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে।

দেবযানীর রক্তবরণ হৃদয়কামনার ফুলকে পদদলিত করে কচের এই বিদায় মর্মাঘাতের কঠিন বেদনা নিয়ে এসেছে। নিত্যদিনের মেলামেশায় পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের কাছে এসেছিল। আজ বিদায় বেলায় দেবযানী তারই রূপরেখা আঁকছে।

জান না কি প্রেম অন্তর্যামী!
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?

অথবা,

কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি
অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া
নড়িলে হিরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার।

পল্লবাচ্ছাদিত পুষ্পগন্ধের মতো প্রেমের প্রকাশরূপ, হীরার বিচ্ছুরিত আলোক রাশির মতো কম্পিত হৃদয়ের প্রণয় ব্যাকুলতা—উপমা হিসেবে দুটিই সুচয়িত এবং ক্লাসিক উপমার রূপরসময়তায় সমৃদ্ধ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আখ্যায়িকা-মূলক কাব্যে আমরা প্রধানতঃ ব্যাখ্যানমূলক ক্লাসিক উপমাই পেয়েছি, এবং কেন পেয়েছি তাও নির্দেশিত হয়েছে। উপমা হিসেবে, রবীন্দ্র-কবিমানসের প্রকৃতি অনুসারে, এ সবের সার্থকতাও বিচার্য। রবীন্দ্রনাথের মতো আধুনিক রোমান্টিক কবিদের কাছে ইঙ্গিতময় উপমাই প্রত্যাশিত। অথচ দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথ এমন সব উপমাও সৃষ্টি করেন যে গুলোতে ইঙ্গিতময়তা নেই, আছে বিষয় ব্যাখ্যার পর্যাপ্ত উপকরণ। এ থেকে ধারণা করা চলে রবীন্দ্র কবিমানস প্রধানতঃ রোমান্টিক হলেও কখনো কখনো ক্লাসিক চেতনায় আচ্ছন্ন। তার প্রমাণ ঢিলে ঢালা আখ্যানমূলক কবিতা ও ব্যাখ্যাধর্মী উপমা। এ শ্রেণীর উপমা সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে মূলতঃ মাইকেলের ক্লাসিক উপমা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, এ হিসেবে এ গুলোকে পুরোনোরীতির উপমাই বলা যেতে পারে। তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানমূলক উপমাগুলো মাইকেলের উপমার মতো বর্ণসুষম ও ধ্বনিগম্ভীর নয়, কেননা মাইকেলের মানস পটভূমি মহাকাব্যিক পরিবেশজাত মূলতঃ, রবীন্দ্রনাথ সেদিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মানসিকতার, এবং এটাও ঠিক রবীন্দ্র উপমায় শ্রেষ্ঠতা এ জাতীয় উপমার দ্বারা প্রমাণিত হবে না। কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের পরিস্ফুটনের জন্য

উপমাগুলো যে কতখানি সুপ্রযুক্ত তা 'কথা ও কাহিনী', 'বিদায় অভিশাপ' ও 'চিত্রাঙ্গদা' ইত্যাদি কাব্যালোচনায় বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদার সেই বিশেষিত উপমাটি বিবৃতিধর্মী হয়েও কতখানি কল্পনা সমৃদ্ধির পরিচয়বহ তা ভুলবার নয়।

রবীন্দ্র উপমায় পুরাণ

রবীন্দ্রনাথের ক্লাসিক উপমার আলোচনার পর্যায়ে পুরাণ-বিশ্লেষণ স্বাভাবিক ভাবে আসে এবং এটাও ঠিক পুরাণ ক্লাসিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের কিছু কাব্যের বিষয়বস্তু পৌরাণিক ভাবকল্পনা থেকে সংগৃহীত। 'কথা ও কাহিনী', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', সবগুলি কাব্যই পৌরাণিক জগত-নির্ভর। 'নতুন করে পাওয়া'র প্রেরণায় এইসব কাহিনীতে নতুনত্ব সাধিত হয়েছে অর্থাৎ রবীন্দ্রকাব্যে পুরাণের পুনর্জন্ম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কিছু উপমা পুরাণ-জগত থেকেই নেওয়া, এ প্রসঙ্গ থেকেই কয়েকটি পৌরাণিক চরিত্র রবীন্দ্রনাথের উপমায় বারবার এসেছে। যেমন গরুড়—এই গরুড়কে নিয়ে উপমা সৃষ্টিতে গতানুগতিকতা লক্ষণীয়। মহাভারতে গরুড়কে বলা হয়েছে অর্ধপক্ষী ও অর্ধমানব, সর্পকুলের প্রধানতম শত্রু গরুড় প্রচণ্ড ক্ষুধা লালন করেন। সম্ভবত., এই কল্পনাকে, আশ্রয় করে 'ভাষা ও ছন্দে' রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি প্রেরণায় বিক্ষুব্ধ বাল্মীকির চঞ্চল মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন,

তরুণ গরুড়সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে।

কিন্তু অন্য জায়গায় যেখানে বলা হয়েছে 'গরুড়সম ঐ যেখানে/উর্ধ্বশিরে গগনপানে/শৈলমালা তুলেছে নীলপাখা/' (৩৩ নং কবিতা : উৎসর্গ) সেখানে প্রাগুক্ত ভাবকল্পনার স্থান নেই। পর্বতকে একটি অতিকায় পাখী হিসেবে কল্পনা করার কারণে গরুড়ের উল্লেখ বিরাটত্ব ও মহিমা বোঝানোর জন্যে।

পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে শিবেরই একচ্ছত্রতা রবীন্দ্র উপমায় লক্ষণীয়।

শিব সংহারকারী, প্রলয়কর্তা। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় 'প্রলয় পিনাক তুলি' পদতলে জগত চেপে শিবের ধ্বংস সাধন প্রণালীর বর্ণনা আছে। পিনাক এর ধনুক, ডমরু এর বিষাণ, সংহারকালে ইনি যে মূর্তিধরেন তা সব কিছু দলিত মথিত করে দেবার দুর্জয় প্রেরণা সম্মত। 'ভাষা ও ছন্দে' হিমালয় শিখর হতে দুঃসহ অন্তর বেগে তীরতরু উন্মূল করে ব্রহ্মপুত্র নদের আপন গতিস্রোত পাবার উন্মত্ততা শিবের রুদ্রমূর্তির সাথে তুলিত,

দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফেরে আপনার কূল উপকূল
তট অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডমরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়।

শিব তার মস্তকের বৃহৎ জটার মধ্যে গঙ্গাকে ধরে রাখেন। এই কল্পনাকেও রবীন্দ্রনাথ কাজে লাগিয়েছেন উপমায়,

শিবের জটার পরে যথা সুরধনী ঝরে
তারা চূর্ণ রজতের স্রোতে
তেমনি কিরণ লুটে সন্ন্যাসীর জটাজুটে
পুরর আকাশ সীমা হতে। [যোগী : ছবি ও গান]

যিনি শিব, তিনিই আবার রুদ্র, তিনিই নটরাজ। হিমালয়ের কোলে মহাযোগী হয়ে তপস্যা করেন বলে তিনি দিগম্বর ধুর্জটি, দেহ তাঁর ভস্মাচ্ছাদিত ও জটাজুটধারী, সংহার শক্তির প্রবলতার জন্য ইনি ভৈরব। শিব সম্বন্ধে ভারতীয় পৌরাণিক কল্পনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপমা সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় দেবদেবীদের মধ্যে শিবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গিজাত পক্ষপাত আছে। শিবের সেই উন্মত্ত রুদ্রমূর্তি, ধ্বংস সাধনের প্রবলতা, তাঁর ভস্মাচ্ছাদিত মহাযোগীর বেশ, তাঁর ভোলা সন্ন্যাসীর মন, দারিদ্র্যের রুক্ষতা ; আবার তাঁর নৃত্যসচল মূর্তি, প্রশান্তির মহিমা,

সবকিছুই ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র-কাব্য চেতনায় প্রভাম্বিত। যে জন্যে 'নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ' বলে তাঁকে তিনি যেমন বন্দনা করেছেন, তেমনি তাঁর রুদ্ররুক্ষ মূর্তিকে মহিমাময় করে তুলেছেন। কল্পনার 'বর্ষশেষ' কবিতায় কালবৈশাখীর উন্মত্ততার মধ্যে রুদ্রশিবের কল্পনা প্রচ্ছন্ন ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু 'বৈশাখ' কবিতায় মধ্যদিনের বৈশাখের দীপ্তদাহে পৃথিবীর শুষ্করুক্ষ দগ্ধতাম্র ভয়াল অবস্থাটি রুদ্রমূর্তির সাথে তুলিত হয়েছে।

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল।

এই উপমা বৈশাখের দিগন্ত বিস্তৃত রসকসহীন রক্ষতা ও শুষ্ক কঠিন ধুসরতার রূপায়ণিক। পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতার রুদ্র শিব প্রশান্তির মূর্তি নিয়ে উপস্থিত, এখানে তাঁর ভোলা সন্ন্যাসীর ছবি, ধ্যানমন্তের অবসানে আপন উদার সৌন্দর্যের রূপ তিনি ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানেই প্রকৃতির ধুসরতা ও ভয়াবহতার সন্ধান পেয়েছেন সেখানেই রুদ্রশিবের তুলনা এনেছেন। পুনশ্চের 'খোয়াই' কবিতায় শরৎকালের রক্ত সন্ধ্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে সে একই পৌনঃ পুণিক কল্পনা,

তখন পৃথিবীর এই ধুসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে
রুষ্ট রুদ্রের প্রলয় কুঞ্চনের মতো।

সমস্ত বর্ণনার মধ্যে একটি আসন্ন ভয়ঙ্কর কিছুর আবহ সৃষ্ট।

পৌরাণিক উপমার মধ্যে কিছু কিছু শুধুমাত্র কল্পনা হিসাবে সার্থক।

অর্থাৎ এসব উপমায় কাহিনীগত বা ঘটনাগত প্রাসঙ্গিক সত্যতার খুব একটা প্রয়োজন নেই, কবি ভাবনায় সে কল্পনা সমৃদ্ধ। যেমন,

কুহেলী গেল আকাশে আলো গেল পরকাশী
ধুর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি। [মহুয়া : সাগরিকা]

কিংবা,

মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন। [খোয়াই : পুনশ্চ]

উদ্ধৃত দুইটি উপমার মধ্যে পৌরাণিক চরিত্র-কল্পনা আছে ঠিকই, কিন্তু বর্ণিত ভাবতত্ত্ব হিসেবে কতখানি সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবুও ভাব প্রকাশের উপায় হিসেবে উপমা দুটি মনোরম। তপোভঙ্গের পর সাথী শিবকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে পার্বতীর খুশীর হাসির সাথে কুয়াশা কেটে যাওয়া আলোর তুলনা মোটামুটি সুন্দর। মরচে ধরা কালো মাটি যেকোন অসুরের মুণ্ড হতে বাঁধা নেই, তবে মহিষাসুরের মুণ্ডের সাথে তুলিত হওয়ার মধ্যে প্রতীতিজাত ভয়ঙ্করতার কল্পনা প্রতিমূর্ত। পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে আরো কেউ কেউ রবীন্দ্র উপমায় স্থান পেয়েছে। দুর্বাসা মুনির কোপ কটাক্ষ অভিশাপভরা ক্রোধের পরিচয়ও রয়েছে,

তখন বর্ষনহীন অপরাহ্ন মেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে,
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায়।
শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু কটাক্ষ ছটায়। [পরিচয় : মহুয়া]

লক্ষ্মী ও বাদ যান নি। অনন্তশায়ী বিষ্ণুর স্ত্রীরূপে বৈকুণ্ঠে তাঁর অধিবাস। এ কল্পনা থেকেই নিম্ন উপমা সৃষ্ট,

শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম।
বৈকুণ্ঠেতে নারায়নীয় সিঁথের পরে নিত্যসিঁদুর সম।
[ফাঁকি : পলাতকা]

সংসারের বিভিন্ন জটিল কাজের ফাঁকে দারুণ রোগ এসে বিনুকে ঘিরে ধরে, দু মাস হাওয়া বদল তার কাছে অমৃত-সমান। সেদিক থেকে উপমাটি বিনুর বঞ্চিত হৃদয়বেদনার কার্যকারিতায় একটি করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

লক্ষ্মী সম্পদের দেবী হলেও তাঁর জ্বালাহীন শান্ত কল্যাণ প্রদ অকৃত্রিম সৌন্দর্যের রূপকল্পনা আছে। মানস প্রিয়ার রূপধ্যানে কবি লক্ষ্মীকে স্মরণ করছেন,

রূপের সাগর মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন
ধীরে ধীরে ওঠো দেখি একবার চেয়ে দেখি
স্বর্ণজ্যোতি কমল আসন। [আচ্ছন্ন : ছবি ও গান]

লক্ষ্মীর পদ্মাসনের উল্লেখও ভুল হয়নি। কিন্তু আসন হিসেবে তাঁর মূল্য যতই থাক, হৃদয়াবেগের প্রতীক হিসেবে তা অপূর্ব,

যখন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মূহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে।
বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব পুলকভরা উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন। [চিত্রাঙ্গদা]

অর্জুনের দৃঢ়কঠিন পৌরুষরূপের প্রেমমুগ্ধতায় কুরূপা চিত্তাঙ্গদার হৃদয় কামনার পরিপূর্ণ বাণীরূপ উপমাটি। পৌরাণিক জগত থেকে উপমার

সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে এই উপমাগুলো সম্বন্ধে একটা কথা বলা যেতে পারে ভাব প্রত্যয়ের দিক থেকে এগুলো অনেকটা স্থির ও অঞ্চল। কিন্তু ভাবপ্রত্যয়ের জন্য উপযুক্ত, অন্তত রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পৌরাণিক তথ্য গুলো ব্যবহার করেন তাতে সুপ্রযুক্তি সম্বন্ধে সংশয় জাগে না। যদিও গতানুগতিকতা রয়েছে। রবীন্দ্রকবিপ্রতিভা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকৃত করতে পেরেছে। সে জন্যে রামায়ন, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি রবীন্দ্রকাব্য চেতনায় নবরূপ লাভ করতে পেরেছে। মহৎ প্রতিভার এটাই বৈশিষ্ট্য। পুরাতনের মধ্যে নবত্বের আবিষ্কার পুরাতনকে প্রবহমান রাখবার কারণ, যেহেতু স্থান ও কাল ভেদে রুচির পরিবর্তন একান্তই স্বাভাবিক। অধুনাতন মানসিকতায় 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ' ইত্যাদি কাব্য সমাদৃত হচ্ছে এগুলোর মধ্যে যুগ-চেতনার প্রভাব আছে বলে। চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানীর ব্যক্তি স্বাশ্রয়ী স্বাতন্ত্র্য তাদের প্রেমচেতনার চেয়ে কিছুটা কম নয়। এ সব কারণে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রকৃতি কিংবা মানুষের বর্ণনা করেছেন তখন কখনো কখনো পৌরাণিক কল্পনা এসেছে শুধু মাত্র ব্যখ্যা হিসেবে নয়, নতুন প্রতীতিবোধ জন্মাতেও।

উপমায় কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

উপমাশিল্পী হিসেবে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে গিয়ে এক আধুনিক সমালোচক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য' যেমন সত্য, 'উপমা রবীন্দ্রনাথস্যও' তেমনি সত্য। সংস্কৃতে যেমন কালিদাস, বাঙলাতেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ, উপমায় অনুপম।' উদ্ধৃতিটি আলাদা আলাদা মূল্যায়নে প্রযুক্ত, অর্থাৎ উপমাশিল্পী হিসেবে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই শ্রেষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কে শ্রেষ্ঠ এ ধরণের তুলনামূলক বিচার নেই। অবশ্য সে বিচারে যে কোন সুফল নেই একথা আমরা জানি, আর সাহিত্য

বিচারে তুলনা কোন সমাধান নয়। প্রথমে স্বীকার করে নেওয়া ভালো কালিদাসের উপমা আর রবীন্দ্রনাথের উপমার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। কালের ব্যবধানও দেখতে হয়, কমপক্ষে দেড় হাজার বৎসরের ব্যবধান কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের কালের। এই বিরাট কাল-ব্যবধান সাহিত্যরীতির ক্ষেত্রে মৌল পরিবর্তন সূচক—বিষয়ে, বক্তব্যে, ভঙ্গিতে, যে কোন দিক থেকেই। সে কারণে উপমা-প্রকৃতিতে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কথা। কালিদাসের কালে উপমা প্রয়োগে একটা নিশ্চয়তা ছিল, সাদৃশ্য কল্পনায় কোন জটিলতা ছিল না এবং এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষতারই ছিল অতিরিক্ত প্রাধান্য। 'চাঁদের মতো মুখ' 'মেঘের মতন চুল' 'হরিণীর মতো দৃষ্টি' বা 'বিম্বের মতো অধর' ইত্যাদি বহু ব্যবহৃত গতানুগতিক উপমাই সাক্ষ্য দেয়া উপমেয় উপমানে কতখানি চোখে দেখা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হতো। এইসব কথায় উপমাশিল্পী হিসেবে কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে না, কালিদাস তাঁর প্রদীপ্ত কল্পনাকে আবেগ ও মননের ক্ষেত্রে সার্থক ভাবে সংস্থাপিত করতে পেরেছিলেন বলে কবি হিসেবে তিনি শুধু স্বকালের নন, সর্বকালের। তাঁর উপমার মধ্যেও এই গুণগুলো,—কল্পনার ঔজ্জ্বল্য, আবেগের সংযম এবং চিন্তার সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি সবই রয়েছে। এসব সত্ত্বেও বলা যেতে পারে কালিদাসের উপমা প্রত্যক্ষতা নির্ভর। কালিদাসের কাল কবেই কেটে গেছে, আজকের দিনে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে উপমা সৃষ্টিতেও নানা বৈপরীত্য সূচিত হয়েছে কালিদাসের কালের প্রতি-তুলনায়। তবুও প্রশ্ন স্বাভাবিক, রবীন্দ্র-কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে কালিদাসের প্রসঙ্গ সরাসরি আসে কেন। এর দুটো কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে—এক, রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব; দুই, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ স্ব স্ব কালের শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা তো বটেই, সাথে বিস্তার গভীরতা ও সামগ্রিকতার বিচারে তাঁরা ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের মূল প্রকৃতিকে ধরে রেখেছেন একই সূত্রে।

স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব নানা দিক থেকে আছে। 'প্রভাব' বলতে অবশ্য আমরা সাধারণ অর্থে ধরে নিচ্ছি না, প্রাচীন সাহিত্যের ভিতর একালের জীবনদর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটানোর স্বীকরণ-প্রক্রিয়াকে আমরা প্রভাব বলছি। এই প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যে শেলী-কীট্‌স্‌ থেকে আছে, রামায়ণ-মহাভারত থেকে আছে, জয়দেব থেকে আছে বৈষ্ণব কবিদের থেকেও আছে এবং সর্বোপরি গভীরতম ভাবে আছে কালিদাসের কাব্যিক বিষয় ও আবহাওয়া থেকে। দুই কবির গভীরতম সংযোগ ঘটেছে কাব্যের উপজীব্যের দিক থেকে এবং ভাষায় সঙ্গীত ধর্মের দিক থেকে, যদিও উভয় কবি ব্যক্তি-স্বাশ্রয়ী পৃথক কবিকর্মের উদ্গাতা। কৈশোর কালেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কালিদাসের কাব্যগুলি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়ার সুযোগ হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা এমনিতেই ধ্বনিব্যঞ্জনা সম্পন্ন, তার উপর মন্দাক্রান্তা ছন্দের বিলম্বিত লয় ভাষাকে করে তুলেছিল তালমান-লয় সম্পন্ন অর্থাৎ সঙ্গীতমুখর। সংস্কৃত কাব্যের এই বৈশিষ্ট্যটুকু রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কালিদাসের কাব্য পড়ে তিনি আনন্দ পেয়েছিলেন প্রচুর এবং সেই আনন্দ নিজস্ব সৃষ্টিকর্মে সঞ্চারিতও করেছিলেন তিনি। সে আনন্দ 'কালিদাসের ব্যক্তি স্বরূপকে, তাঁর যুগকে, ও সে যুগের ভারতবর্ষকে আবিষ্কারের আনন্দ।'[৩] সুতরাং কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগের স্বাভাবিকতা নিশ্চয়ই রয়েছে এবং সে কারণে যে রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব অনুস্যূত একথা সত্য। রবীন্দ্রকাব্যে কুমার সম্ভব, ঋতু সংহার ইত্যাদি কাব্যের প্রভাব যতখানি না আছে তার চেয়ে বেশী আছে মেঘদূতের।[৪] মেঘদূত বর্ষা ও বিরহের কাব্য, এই বর্ষা ও বিরহের পটভূমিকায় মানবহৃদয়র চিরন্তন আর্তিকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেঘদূত প্রভাবান্বিত বিভিন্ন কবিতায়। 'মেঘদূত' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

> আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল

> অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে ; আমাদের বিরহ-বিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্তলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি।
>
> কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল স্পর্শ বিরহ।[৫]

কবির কথাতেই বোঝা যাচ্ছে শুধু অতীত নয়, শুধু বর্তমান ও নয় সকলকালেরই মানুষের মনে বিরহের গভীর স্পর্শ রয়েছে। মানসীর 'মেঘদূত' কবিতায় এই চিরন্তন-বোধ কবিকে অতীতচারী করে তুলেছে, ক্ষণিকার 'সকাল' কবিতায় কালিদাসের কালকে রবীন্দ্রনাথ প্রেম সৌন্দর্য ও অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে পেতে চেয়েছেন সমকালীন যুগচাঞ্চল্য ও বিক্ষুব্ধতায় পীড়িত হয়ে কিনা জানি না, তবে সেই সমৃদ্ধিশালী ও ঐশ্বর্যময় কালের একটি সম্ভাব্য চিত্রের ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনে বরাবরই ছিল এবং অতীতচারী মানসিকতার কোন এক বিমুগ্ধ পর্যায়ে স্বপ্নের অতলতায় অবলুপ্ত[৬] হয়েও সেই কালকে অনুভব করার দুর্মর প্রয়াস লক্ষণীয়। এবং যেহেতু কালিদাস সেই বর্ণাঢ্য যুগেরই কবি ছিলেন ; সম্ভবতঃ সে জন্যে তাঁর কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ এত গভীর। রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা এখানে উপমার আলোচনা করছি। একটা ব্যাপার অত্যন্ত বিস্ময়কর যে ব্যাপক কাব্যিক প্রভাব সত্বেও রবীন্দ্রনাথ কালিদাস থেকে উপমা নেননি, যে দু একটা নিয়েছেন সেগুলো হুবহুই নিয়েছেন এবং তা 'মেঘদূত' কাব্য থেকে। মেঘদূতের স্মৃতি, চিত্রকল্প ও ভাবনা রবীন্দ্রকাব্যে অজস্র ছড়িয়ে আছে। যেমন 'স্বপ্ন' কবিতার একটি অংশ,

> মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে
> কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে।
> তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
> চরণে নূপুর খানি বাজে আধা আধা।

পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ার এই বর্ণনা হুবহু কালিদাস থেকেই নেওয়া, হয়তো একটু আধটু অমিল থাকতেও পারে,

হস্তে লীলাকমল মলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম।[৭]

কালিদাসের উপমা রবীন্দ্রকাব্যে দু'একটা ছাড়া নেই। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূতের সাথে কালিদাসের মেঘদূতের পরিবেশ ও আবহগত সমান ধর্ম অনেকাংশে লক্ষণীয় এবং শুধু বর্ণনা কোন কোন জায়গায় একরকম নয় উপমাও একই। 'মেঘদূত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিরহকাতরা যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন,

মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন তনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।

মূল মেঘদূতে একই বর্ণনা রয়েছে,

আধিক্ষামাং বিরহ শয়নে সন্নিষন্নৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্র শেষাং হিমাংশো :।[৮]
[বিরহ শয্যায় শুয়েছে একপাশে শীর্ণতনু মনোকষ্টে
পূর্বাকাশে যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের শেষকলা উদিত][৯]

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত উপমাটি একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ বললে ভুল বলা হবে না। আরো একটি উপমা,

রুদ্ররাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়েছে হিমরাশ
পর্বতদৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস।[১০]

এ বর্ণনার সাথে কালিদাসের একটি শ্লোকের সাযুজ্য সহজেই পরিলক্ষিত,

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিত : খং
রাশীভূত : প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥[১১]

[মহান তার চূড়া ব্যাপ্ত করে নভে শুভ্র কুমুদের কান্তি
নিত্য জমে ওঠা অট্টহাসি যেন রাষ্ট্র করেছেন ত্র্যম্বক ।][১২]

তুষার শুভ্রকান্তি, সংস্কৃত প্রথানুসারে হাসিও তাই। কৈলাস পর্বত চূড়ায় যে তুষার জমে উঠে তা যেন মহাদেবের অট্টহাসি। রবীন্দ্রনাথের উপমাটিতে মহাদেবের বা কৈলাসের উল্লেখ নেই। তবুও আমাদের বুঝতে দেরী হয় না এ উপমা কালিদাস থেকেই নেওয়া। যা হোক, উপরোক্ত দুটি উপমা ছাড়া প্রায় একই রকম করে নেওয়া অন্য কোন কালিদাসীয় উপমা রবীন্দ্রকাব্যে নেই এ সত্য সম্ভবতঃ ঠিক।

কালিদাসের উপমার প্রধান বৈশিষ্ট্য চিত্রধর্মিতা—ছবি হিসেবে উপমা-গুলো এতই মনোমুগ্ধকর ও চিত্ত চমৎকারী যে কালিদাসের প্রতিভার অসাধারণত্বই শুধু মনে জাগে। চোখে দেখা অভিজ্ঞতাকে কত সুষমভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তার প্রমাণ তাঁর উপমাগুলো। মেঘদূতের পূর্বমেঘ অংশে যক্ষ মেঘের গমন পথের সব বর্ণনা খুটিয়ে খুটিয়ে দিচ্ছে, এক জায়গায় বলছে,

বীচিক্ষোভস্তনিত বিহগশ্রেণী কাঞ্চী গুনায়াঃ
সংসর্পন্ত্যা স্খলিত সুভহং দর্শিতা বর্তনাভেঃ।[১৩]

[দেখবে যেতে যেতে স্খলিত মনোরম ভঙ্গি নেয় নির্বিন্ধ্যা
ঢেউয়ের সংঘাতে মুখর বিহগেরা রচনা করে তার কাঞ্চীদাম।][১৪]

উর্মিচঞ্চল নির্বিন্ধ্যা নদীর উপরে উড্ডীয়মান আনন্দিত বলাকাশ্রেণী যেন তার কোমর বেষ্টিত কাঞ্চীমালা, চিত্র হিসেবে এটি অনুষঙ্গপ্রধান, কোমরে কাঞ্চী পরিবেষ্টিত একটি নিত্যরতা মেয়েই যেন উর্মিচঞ্চল নির্বিন্ধ্যা

নদী। অত্যন্ত চমৎকার চিত্র, প্রতীয়মানের কল্পনায় সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী। উত্তরমেঘে বিরহ শয্যাশায়িনী যক্ষপ্রিয়া প্রিয়বিরহে অশ্রুজলের বেদনায় মুহ্যমান। সে যেন,

সাভ্রেহ্নীব স্থল কমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম ॥[১৬]

[মেঘলা দিনে যেন মলিন কমলিনী, জেগেও নেই, নেই ঘুমিয়ে][১৬]

অশ্রু ভারাতুরা নায়িকা আর মেঘলা দিনের মলিন কমলিনীর মধ্যে স্বাভাবিক লক্ষণজাত সাদৃশ্য কল্পনাই প্রমাণ দেয় কালিদাসের উপমা কত-খানি প্রত্যক্ষতা নির্ভর। কালিদাসের উপমা আলঙ্কারিক বিচারে সম্পূর্ণ, কোথাও ফাঁক নেই, উপমেয় উপমাতে অটুট সম্বন্ধ সর্বত্র রক্ষিত, এই সম্বন্ধ দীর্ঘব্যবহারের ফলে গতানুগতিক শৃঙ্খলায় দাঁড়িয়ে গেছে সংস্কৃত কাব্যে। কালিদাসের উপমায় দৃশ্য অদৃশ্য, বস্তুভাবনা বা মূর্তঅমূর্তের সম্বন্ধ নেই, আছে স্বাভাবিক লক্ষণগুণে অনুরূপ প্রতীয়মানের একসূত্রকরণ। সার্বিক বিচার রবীন্দ্রনাথের উপমা মূল প্রকৃতির দিক থেকে কালিদাসের উপমার সমধর্মী নয়। অবশ্য কিছু কিছু উপমা সৃষ্টিতে তিনি যে কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন সে কথা সত্য। নিম্ন উপমাটি এ ক্ষেত্রে বিচার্য,—

ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল
নীরব আসিস সম হিমাচল
তবু বরাভয় কর।
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে পূরণ
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষপর। [১৬ নং কবিতা : উৎসর্গ]

বিশ্বদেবতার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই উপমাত্মক রীতি গ্রহণ

করেছেন। নীল আকাশ বিশ্ব দেবতার ললাট, হিমালয় বরাভয় হাত, আর জাহ্নবী (নদী) হার ভূষন স্বরূপ। বিপুল উপমান-মালার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-দেবতার মহিমা যতই ব্যাখ্যাত হোক না কেন, চিত্র হিসেবে একে গ্রহণ করতে আমাদের অসুবিধা হয় না। নদীকে হাররূপে কল্পনা করা চিত্রাত্মক মানসিকতার পরিচায়ক এবং সেটা কালিদাস থেকেই পাওয়া। চিত্রার 'রাতে ও প্রভাতে'র উপমাটি এ ব্যাপারে লক্ষণীয়,

দেবী, তব সিঁথি মূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুর রেখা
তব বামবাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।

দেবীর সিঁথিমূলে যে সিঁদুররেখা অঙ্কিত তা উপমিত হয়েছে প্রভাত সূর্যালোকের সঙ্গে, আর যে শঙ্খবলয় দেবীর বামবাহু বেষ্টিত তা যেন নবোদিত চন্দ্র। রূপ ও গুণের দিক থেকে শঙ্খ আর দ্বিতীয়ার চাঁদ একই। শঙ্খ যেমন গোলাকার, চাঁদও তেমনি গোলাকার, প্রথম কলায় চাঁদের ভিতরটা পূর্ণ হয়নি। চাঁদ সাদা, শঙ্খও সাদা। চিত্রল উপমা হিসেবে এটি সবিশেষে উল্লেখযোগ্য এবং এ শ্রেণীর উপমাকে কালিদাসীয় উপমা বলে সহজেই চালানো যেতে পারে। উপমা-শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতা এই সবে নেই, আছে সেই সবে যেখানে তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য, বস্তু-ভাবনা বা সীমা অসীমের সংযোগ সাধন করেছেন অথবা যেখানে শুধু অদৃশ্যকে অদৃশ্য দিয়ে, ভাবকে ভাব দিয়ে, অসীমকে অসীম দিয়েই অনুভব করবার প্রয়াস পেয়েছেন। সে জন্যে রবীন্দ্রনাথের উপমা কালিদাসের উপমার মতো রূপগুণের সম্পূর্ণতা থাকে না, থাকে শুধু ভাবের ইঙ্গিতটুকু। রবীন্দ্রনাথের মূর্ত-অমূর্ত দ্যোতনাজাত ভাবধর্মী উপমাগুলো পরবর্তী এক পর্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। এখানে শুধু একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে কালিদাসের উপমার সাথে রবীন্দ্রনাথের উপমার পার্থক্য বুঝবার জন্যে,—

স্বপ্নের সুধীর স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ
স্বপ্ন হতে নিঃস্বপ্ন অতলে,
ভাসানো প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্ধ্যাবায়ে
ডুবে যায় জাহ্নবীর জলে। [শ্রান্তি : মানসী]

উপমাটিতে প্রাণ-প্রদীপের সাথে তুলিত হয়েছে, অর্থাৎ অমূর্তকে মূর্তে সীমায়িত করার চেষ্টা চলছে। উপমেয়-উপমান সম্বন্ধ উদ্ধৃটিতে রহস্যময়তা সৃষ্টি করেছে প্রথম থেকেই, তারপর সামগ্রিক ব্যখ্যায় রহস্যময়তা আরো গভীর হয়েছে। সন্ধ্যাকালে নদীস্রোতে ভাসানো প্রদীপ যেমন বাতাসে নিভে গিয়ে জলে ডুবে যায়, প্রাণও যেন তেমনি স্বপ্নের অতলতায় লীন হয়ে গেছে। উপমা এইভাবে ভাবনার গূঢ় ব্যঞ্জনায় কোন সুদূরের প্রতি ইঙ্গিতকৃত। কালিদাসীয় উপমায় এই ব্যঞ্জনা পাওয়া যাবে না। কারণ কবি প্রকৃতির দিক থেকে কালিদাস বস্তুধর্মী। তিনি তাঁর কবিতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখেছেন, শুধু বিষয় বর্ণনার মধ্যে তাঁর কাব্যিক চমৎকারিত্ব নিহিত। তিনি তাঁর ভাবনাকে আয়ত্বে ধরে রাখতে চান সন্দেহ নেই কালিদাসের সবগুলি উপমাই প্রকৃতির বিরাট পাটভূমিকা থেকে সংগৃহীত এবং সে উপমা বর্ণনা ও উপস্থাপনার দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সহজবোধ্য, কল্পনা কোথাও ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার বাইরে নয় এবং সহজ হৃদয়ঙ্গমতায় তার কার্যকারিতা। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতি থেকে উপমা চয়ন করেছেন প্রচুর, প্রাকৃতিক প্রত্যক্ষতার মধ্যে তাঁর উপমা শেষ হয়ে যায় না। তিনি তাঁর মধ্যে তাঁর ভাবনা চিন্তা ও কল্পনাকে কবিতার মধ্যেই সংস্থাপিত করেছেন। সে দিক থেকে কবিতার সাথে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন। তাঁর উপমা ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দেয় প্রাথমিকভাবে, তারপর ইন্দ্রিয়াতীতের সুদূরতায় বিলীন হয়ে যায়।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে কবিধর্মের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ Subjective ও Romantic, আর কালিদাস Objective ও Classical। দুই কবির উপমার প্রকৃতিগত পার্থক্য এই কবি-ধর্মের মধ্যে নিহিত।

রবীন্দ্র উপমায় প্রকৃতি

রবীন্দ্রকাব্যের একটা প্রধান উপাদান প্রকৃতি। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় তাঁর কাব্যে 'বিশেষ প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা নগণ্য, কিন্তু তাঁর সবগুলো কাব্যে প্রকৃতি এমনভাবে মিশে আছে যে সেগুলোকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করা যায় না। এর তাৎপর্য হলো প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্য চেতনায় ব্যাপকভাবে সংস্থাপিত। প্রকৃতিকে সত্তার অভিপ্রকাশ রূপে অনুভব করে রোমান্টিক কবিদের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছেন 'মানুষ ও প্রকৃতির প্রতিমূর্তিই কাব্য'। রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতিতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় আত্মা-সন্ধানী তত্ত্ব না থাকলেও প্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের অনুভূতিময় ব্যঞ্জনার প্রতিফলন রয়েছে। এ জন্যে রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি চৈতন্য-নিরপেক্ষ নয়, কবিপ্রাণের নিগূঢ় সংকেত-নির্ভর। এ চৈতন্যের অন্তর্লীন রূপটি এর প্রাণ এবং প্রাণই সৌন্দর্য। প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে কবিপ্রাণে এক রহস্যঘন অনুভূতির জন্ম এবং এ চেতনায় তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করছেন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর বন্ধন অনাদিকালের। রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে এ ভাবটি ব্যক্ত,

> আমার এইযে মনের ভাব এ যেন প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত সূর্যসনাথা আদিম প্রকৃতির ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে।[১৭]

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবিসত্তার কতখানি মর্মগত বন্ধন থাকলে এ উপলব্ধি জন্মে তা ধরণাতীত। সে দিক থেকে উপমা চয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিচেতনাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাবেন এটা স্বাভাবিক। বর্ণনীয় বিষয়ের বস্তুরূপটি তিনি যতটা পারেন প্রকৃতির সাথে তুলনা দিয়ে প্রকৃতির নিকটবর্তী করবার চেষ্টা করছেন। প্রকৃতির গাছপালা, নদীনালা, ফুলফল,

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, সকাল, সন্ধ্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা সবকিছুই তিনি উপমার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক চেতনার বশবর্তী হয়ে ব্যবহার করেছেন—কবিজীবনের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত প্রকৃতি সত্তার অভিপ্রকাশ রূপে থেকে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বলা যেতে পারে উপমার মধ্যে এ দিকে তিনি যেমন মানুষকে প্রকৃতির নিকটবর্তী করেছেন, (যেমনি প্রকৃতিকে মানবীয় অভিজ্ঞতায় ও পারিপার্শ্বিকতায় বুঝতে চেষ্টা করেছেন), যদিও সংখ্যার দিক থেকে এ জাতীয় উপমা খুব একটা প্রধান নয়। একই প্রসঙ্গে কালিদাসের উপমার কথা আসে। কালিদাসের উপমাও, রবীন্দ্রনাথের মতো, মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রেখেছে। কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে উভয় কবির কবিধর্ম স্ব স্ব উপমাকে পরস্পর থেকে পৃথক করেছে। এ ক্ষেত্রে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের একটি উপমা বিচার্য। বসন্তের পুষ্পপত্রশোভিত হিমালয়কন্যা উমা যখন এদিক ওদিক ঘুরে ফিরছিলো তখন মনে হচ্ছিল,

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভাং
বাসো বসাকা তরুণার্ক রাগম্।
পর্যাপ্ত পুষ্পতবকাব নম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

[স্তনদ্বয়ের ভারে ইষৎ অবনমিতা তরুণ অরুণবৎ রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা পার্বতী যেন প্রচুর পুষ্পস্তবকে আনম্র একটি সঞ্চারিণী পল্লবিণীলতা।][১৮]

কালিদাসের একটি অপূর্ব চিত্রধর্মী উপমা হিসেবে এর চিত্তাকর্ষকতা সহজেই পরিস্ফুট, প্রকৃতির রূপগুণের সঙ্গে মানুষের রূপগুণের অবিমিশ্র সম্বন্ধ স্থাপনের সার্থক প্রয়াস। 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' কথাটির মধ্যে প্রচুর পুষ্পপত্রভারে অবনত লতার লাস্যভঙ্গিমার চিত্র রয়েছে, এরই মতো যেন উমার যৌবনপুষ্ট অঙ্গের গতিশীল ভঙ্গিমা।

রবীন্দ্রনাথের উপমায়, কালিদাসের মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্কিত উপমার প্রতিতুলনায়, রূপগুণের সাদৃশ্য কল্পনার কোন প্রাধান্য নেই, আছে ভাবের ইঙ্গিত। কালিদাস চিত্র সৃষ্টি করেন এবং বর্ণসুষমায় সে চিত্রকে রঞ্জিত করেন; রবীন্দ্র-উপমায় চিত্র প্রাথমিক স্তর, অর্থাৎ বহিরাবরণ মাত্র; এটা সরে গেলেই তাঁর উপমা-প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত কিছু রবীন্দ্র-উপমার আলোচনা করা যেতে পারে প্রসঙ্গে। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যে মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার অরণ্যজীবন প্রকৃতিনির্ভর উপমা দ্বারা বোঝানো হয়েছে,

যেন আমি রাজকন্যা নহি, যেন মোর
নাই পূর্বাপর। যেন আমি ধরাতলে
একদিন উঠেছি ফুটিয়া অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল।

প্রেম-কুসুমকাহিনীর আন্তরিক উপলব্ধির ইঙ্গিত আছে শুধু, কোন বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা নেই। 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' জাতীয় কোন চিত্রকল্পনাকেও স্থান দেওয়া হয়নি। চিত্রাঙ্গদাকে শুধু ফুলের সাথেই তুলনা করা হয়েছে; ফুলের কোন শোভা নয়, সৌন্দর্য নয়। কেউ বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ কোন কোন উপমায় প্রকৃতির রূপচিত্রকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন নিম্ন উপমাটি,

শীতের শেষে যেমন পত্রভার
খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা-সার
আমার হলো তেমনি দশা। [ছিন্নপত্র : পলাতকা]

কিন্তু এখানে মানুষকে নয়, মানুষের অন্তর্নিহিত হৃদয় রূপটিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে এবং এটা স্বাভাবিকও, সংসারের অর্থকরী নানা কর্মে আবদ্ধ থেকে সময়বঞ্চিত সুখ ও আনন্দের স্পর্শ না পেয়ে জীবন যখন শুকিয়ে

আসে তখনই এ উপলব্ধি জন্মে। এদিক থেকে সমস্ত উপমাটির ভাবগত দিকই প্রধান। আরেকটি উপমা,

ওর ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমা রাতের ঘুমহারানো অলস চাঁদ
সকাল বেলার শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়। [অকাল ঘুম : শ্যামলী]

অকাল ঘুমে পাওয়া কর্মক্লান্ত কবিগৃহিণীর দৈহিক শ্রান্তরূপ ভোরের নির্জন মাঠের দিগন্ত শিয়রে মরে যাওয়া চাঁদের দীপ্তিহীন ঔজ্জ্বল্যের সাথে তুলিত হয়েছে। এটাও সমশ্রেণীর উপমা এবং যদিও এর চিত্রগত দিকটা তুচ্ছ নয়, তথাপি ভাবেরই প্রতি কবিদৃষ্টি প্রখর। দৃশ্যকল্প অনুভূতির গাঢ়তায় অবলুপ্ত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের উপমায় ভাব ও চিত্রের যুগপৎ সম্মিলনই পরিলক্ষিত। এদিক থেকে তাঁর উপমা ভাবচিত্র, কালিদাসের বেলায় তা রূপচিত্র।

উপমার পৌনঃপুনিকতা

রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতিনির্ভর উপমার এত প্রাচুর্য যে সেগুলোকে এক যায়গায় জড়ো করা এক বিরাট কাজ। একটা ব্যাপার সকলের চোখে পড়বে যে প্রকৃতির কিছু কিছু উপকরণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পক্ষপাত রয়েছে, যেমন ফুল। ফুলকে ঘিরে উপমা সৃষ্টির এতই ছড়াছড়ি যে গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত। ফুল সম্পর্কিত কয়েকটা উপমার উদাহরণ এর প্রমাণ।

১. নবীন রবির আলো
সে যে কী লাগিত ভালো
সর্বাঙ্গে সুবর্ণ সুধা অজস্র পড়িত ঝরে
প্রভাত ফুলের মতো ফুটায়ে তুলিত মোরে।
[পূর্ণ মিলন : প্রভাত সংগীত]

২. শেষে দেখিব পড়িল সুখযৌবন
ফুলের মত খসিয়া। [ভৈরবী গান : মানসী]

৩. আঁচল খানি পড়েছে খসি পাশে
কাঁচল খানি পড়িবে বুঝি টুটি ;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি। [নিদ্রিতা : সোনারতরী]

৪. শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি
বাজাই বসিয়া প্রাণ মন খুলি
পুষ্পের মতো সংগীত গুলি
ফুটাই আকাশ ভালে। [পুরস্কার : সোনারতরী]

৫. মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুটিত ফুলের মতোন। [সুখ : চিত্রা]

উপমান 'ফুলের' উপমেয় বিভিন্ন এবং এটা স্বাভাবিক, অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে। কেননা রবীন্দ্রকাব্যে রীতিগত দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার অনুবর্তন নেই, তাঁর কল্পনা কোন স্থায়ীবস্তুস্বরূপে আবদ্ধ নয়। ফুলের যেটা গুণগত দিক সেটা প্রফুল্লতা, সরসতা ও সজীবতার আলোকে প্রোজ্জ্বল। সে দিক থেকে ফুল রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশক। এই সৌন্দর্য ফুলের কল্পনায় দাহহীন জ্বালাহীন কামনাবিচ্যুত সরস সৌন্দর্য। এ হিসেবে 'ফুল'কে রবীন্দ্র-কাব্যচেতনার একটি শব্দ-প্রতীকও বলা যেতে পারে। উপমা চয়নে রবীন্দ্রনাথ আরো যে কয়েকটি শব্দকে বারবার ব্যবহার করেছেন এবং অতি ব্যবহারের ফলে সেগুলো একঘেয়েমিতে পরিণত, সেগুলোও রবীন্দ্রকাব্যভাবনার শব্দ-প্রতীক হয়ে উঠেছে, যেমন—প্রভাতের আলো, শিশির, সাগর, নদী, নির্ঝর, আকাশ,

বিদ্যুত, মেঘ, ঝড়, চন্দ্র, সূর্য, পদ্ম, তৃণ, পাখী, পতঙ্গ, ভ্রমর, অগ্নি, সর্প, শিশু ইত্যাদি। প্রত্যেকটি উপমা প্রকৃতি ও মানুষ সমন্বিত বৃহৎ বিশ্বজগত থেকে সংগৃহীত। সে হিসেবে এগুলো বিশ্বজীবনচেতনার স্বাক্ষর এবং রবীন্দ্রজীবন-দর্শনের একটি মূল সূত্ররূপে পরিগণিত। কিন্তু প্রত্যেকটি উপমা কত পৌনঃপুনিক রীতিতে ব্যবহৃত তা কিন্তু নিম্ন তালিকা থেকে স্পষ্ট হবে।

প্রভাত ॥

১· আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাত রশ্মি সম। [সুরদাসের প্রার্থনা : মানসী]

২· বিস্মৃতি সাগর নীল নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছে ধীরে। [অহল্যার প্রতি : মানসী]

৩· উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা। [উর্বশী : চিত্রা]

সন্ধ্যা ॥

১· কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ
সন্ধ্যার মতো পরি রাঙাবাস [পুরস্কার : সোনার তরী]

২· স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেঁসেছিলে [উপহার : সন্ধ্যাসংগীত]

৩· নিঃশব্দে দিনের অন্তে আসে অন্ধকার
তেমনি হউক শেষ শেষ যা হবার। [সমাপ্তি : চৈতালী]

আকাশ ॥

১· ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ পূর্ণিমার আকাশের মতো [বিজয়ীনী : চিত্রা]

২. স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বর সম [মানস সুন্দরী : সোনারতরী]

৩. ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ।
[৯৫ নং কবিতা: বলাকা]

তারা ॥

১. সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁখির মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারা সম। [বিদায়: মানসী]

২. একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও, একান্ত নির্জন
সন্ধ্যার তারার মতো। [জ্যোৎস্নারাতে : চিত্রা]

৩. আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে। [গীতবিতান]

সূর্য ॥

১. উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম [ধ্যান : মানসী]

২. অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
জ্বলন্ত মেঘের সাথে দীপ্ত সূর্য প্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল মূরতি। [নরকবাস : কাহিনী]

৩. আশীর্বাদ করো মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন
সুমেরু শিখর শিরে সূর্যের মতন।
[কচের উক্তি : বিদায় অভিশাপ]

চন্দ্র ॥

১. সভাশেষে
তুমি এলে নিশান্তের শশাঙ্ক-সমান
ভক্তভৃত্য মোর [আবেদন : চিত্রা]

২. তব বামবাহু ঘেরি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা [রাতে ও প্রভাতে : চিত্রা]

৩. শুভ ললাটে ইন্দুসমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি
[অভিসার : কথা]

মেঘ ॥

১. বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন
নির্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন। [আকাঙ্খা : মানসী]

২. বিদায় বেলা এল মেঘের মতো ব্যেপে
[৪০ নং কবিতা : উৎসর্গ]

৩. সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন [স্মরণ : সেঁজুতি]

বিদ্যুৎ ॥

১. এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
[মদনভস্মের পূর্বে : কল্পনা]

২. কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান ! [অশেষ : কল্পনা]

৩. কোষ মাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্র নিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ-সমান
নিদ্রাগত। [গান্ধারির আবেদন : কাহিনী]

বজ্র ॥

১. দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন [বসুন্ধরা : সোনারতরী]

২. অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহো সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো [সমুদ্রের প্রতি : সোনারতরী]

৩. যুদ্ধদ্বন্দ্ব যতকিছু নিদারুণ বাজে
বহ্নিমান বজ্রসম সর্বত্র স্বাধীন। [সোনার বাঁধন : সোনারতরী]

ঝড় ॥

১. দীর্ঘ তীক্ষ্ম হই ক্রমে তীব্র গতিবলে
ব্যাঘ্রগামী ঝটিকার আত্মস্বর সম [মরণ স্বপ্ন : কড়ি ও কোমল]

২. ধাও গান, প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে। [বর্ষশেষ : কল্পনা]

৩. বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার আনিয়াছে সাথে করিয়া
[৩৯ নং কবিতা : উৎসর্গ]

সাগর ॥

১. অধীর সিন্ধুর মতো কলধ্বনি তার [শেষ কথা : চৈতালী]

২. ওই মরণের সাগর পারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপন রূপে [গীতবিতান]

৩. সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার [১ নং কবিতা : শেষলেখা]

নদী ॥

১. স্ফীত করি স্রোতাবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিনী সম। [মেঘদূত : মানসী]

২. সংসার স্রোত জাহ্নবী মম
বহু দূরে গেছে সরিয়া [বিশ্বনৃত্য : সোনারতরী]

৩. হে তটিনী, সে নগরে নাই কলস্বন
তোমার কণ্ঠের মতো। [বিদায় : চৈতালী]

নির্ঝর ॥

১. হৃদয় পাষাণ-ভেদী নির্ঝরের প্রায়
জড়জন্তু সবা পানে নামিবারে চায় [হৃদয় ধর্ম : চৈতালী]

২. ঝরণা সম জগৎ মম
ঝরিবে শিরে। [শূন্য-হৃদয়ের আকাঙ্খা : মানসী]

৩. যদি কথা মনে পড়ে, তবে কলস্বরে
কয়ে যেয়ো কথা, তরল আনন্দ ভরে
নির্ঝরের মতো। [মানস সুন্দরী : সোনারতরী]

তরঙ্গ ॥

১. তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার। অসময় : চৈতালী]

২. সে সবার কণ্ঠস্বর—কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম
তব কাব্য হতে। [মেঘদূত : মানসী]

৩. ঢেউয়ের মতন ভাষা বাঁধন হারা
আমার সেই রাগিনী শুনবে নীরব হেসে [৮৩ নং : গীতাঞ্জলি]

স্রোত ॥

১. কর্ম শালা হতে
ফিরে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন
বাঁধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন ॥ [করুণা : চৈতালী]

২. তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলু কুলু নদীর স্রোতের মতো। [তোমরা আমরা : সোনারতরী]

৩. এক গিরি হইতে দুই স্রোত-পারা
দুইটি শীর্ণ বিদ্বেষ-ধারা
সরীসৃপ গতি মিলিল তাহারা
নিষ্ঠুর অভিমানে [পুরস্কার : সোনারতরী]

আলো ॥

১. তারার আলোর মতো হাসিগুলি আসে কত [ঘুম : ছবিও গান

২. গোপনে প্রেম রয় না ঘরে
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে [গীতাঞ্জলি

৩. যার ছায়া সুরে খেলা করে
চঞ্চল দিঘীর জলে আলোর মতন থরথরে [তর্ক : আকাশপ্রদীপ]

ছায়া ॥

১. তরুতলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুলবনে [সারাবেলা : কড়ি ও কোমল]

২. আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মত নাইকো কিছু [সোজাসুজি : ক্ষণিকা]

৩. বিপুলা এ বসুমতী
ধীরে মিলাইয়া আসে ছায়ার মতন
লয়ে তার সিন্ধুশৈল কান্তার কানন [২৯ নং কবিতা : নৈবেদ্য]

রাত্রি ॥

১. আজি শ্রাবণ - ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে [গীতাঞ্জলি]
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

২. নিশাচরের ডানার ঝাপট আকাশে আকাশে
নিশীথিনির হৃৎকম্পনের মতো। [চিররূপের বাণী : পুনশ্চ]

৩. তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে। [বর্ষশেষ : কল্পনা]

লতা ॥

১. ব্যাকুল শরমে অসহ্য ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্ন লতিকা সমা [পতিতা : কাহিনী]

২. ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মতো জড়িয়ে থাকে। [পথে : ক্ষণিকা]

৩. পরশ কার পুষ্প বাসে পরাণ মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে।
[মদনভস্মের পরে : কল্পনা]

পাতা ॥

১. স্মরণের চিহ্ন-যত ছিল পড়ে দিন কত
ঝরে পড়া পাতার মতন। [পুরাতন : কড়ি ও কোমল]

২. তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো ।
[গীতোচ্ছ্বাস : কড়ি ও কোমল]

৩. বাদ প্রতিবাদ যত
শুকনো পাতার মত
কোথা হল অপগত। [শীতে ও বসন্তে : চিত্রা]

ঘাস ॥

১. খুদে খুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে
[পত্র : কড়ি ও কোমল]

২. বৈশাখের ঝড়ে
ধেয়ে এলি ভয়ঙ্করী ধূলি বক্ষপরে
তৃণসম করিবারে প্রাণ উৎপাটন। [অজ্ঞাতবিশ্ব : চৈতালি]

৩. ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়। [বর্ষশেষ : কল্পনা]

পদ্ম ॥

১. প্রভাত কিরণ গুলি চৌদিকে যেতেছে খুলি
যেন শুভ্র কমলের দল। [স্নেহময়ী : ছবি ও গান]

২. বায়ুর হিল্লোলে তাই আকুল কুমুদ সম
কথাগুলি কাঁপে থরথর। [আচ্ছন্ন : ছবি ও গান]

৩. এ বিস্ময় মোর পানে অপনারে নিত্য অছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন। [সৃষ্টি রহস্য : কল্পনা]

শিশির ॥

১. তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নতুন
নব প্রভাতের মাঝে শিশিরের মতো।
[অস্তাচলের পরপারে : কড়ি ও কোমল]

২. আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ পরে
শিশিরের মতো রবে। [পুরস্কার ; সোনার তরী]

৩. ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন—
ছুঁয়ে থেকে তুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে। [উদ্বোধন : ক্ষণিকা]

সৌরভ ॥

১. সৌরভের মতো তোরে
নিয়ে যাব চুরি করে। [মঙ্গল গীত : কড়ি ও কোমল]

২. ফুলের সৌরভসম হৃদয়-উচ্ছ্বাস [বিদায় অভিশাপ]

৩. সৌন্দর্য-কোরক টুটে এসো গো বাহির হয়ে
অনুপম সৌরভের প্রায় [আচ্ছন্ন : ছবি ও গান]

পাখী ॥

১. খাঁচার পাখীর মতো গান গেয়ে মরা
[কবির অহঙ্কার : কড়ি ও কোমল]

২. ছায়ায় কুটিরখানা দু ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীগণ করিছে বিরাজ। [কুহুধ্বনি : মানসী]

৩. বিরহী পাখীর প্রায় অজানা কানন ছায়
উড়িয়া বেড়াক সদা হৃদয়ের কাতরতা।
[মৌনভাষা : মানসী]

ভ্রমর ॥

১. ভ্রমর যেমন থাকে কমল শয়নে
সৌরভ সদনে, কারো পথ নাহি চায়
পদশব্দ নাহি গণে, কথা নাহি শোনে
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়। [নিভৃত আশ্রম : মানসী]

২. মোহ-চঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণাবরণ ভ্রমরের সম।
[সুরদাসের প্রার্থনা : মানসী]

৩. অক্লান্ত বিস্ময়
যার প্রাণে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।
[অবরুদ্ধ ছিল বায়ু : প্রান্তিক]

শিশু ॥

১. খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তন পানরত শিশুর মতন
[বসুন্ধরা : সোনারতরী]

২. অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন।
[সমুদ্র : কড়ি ও কোমল]

৩. তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার মাঝখানে
কোলের শিশুর মতন।

[সমুদ্রের প্রতি : সোনারতরী]

দীর্ঘ তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে কতকগুলো উপমা রবীন্দ্রকাব্যে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। উপমা হিসেবে এগুলোর বিস্ময়করতা নেই এমনিতেও, তার উপর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে সবগুলো স্বাদহীন বর্ণহীন হয়ে গেছে এবং এইসবে উপমেয় উপমানে এত বেশী সহজ সাযুজ্য যে তাতে আবিষ্কারের প্রতীতিবোধ জন্মায় না। অর্থাৎ কল্পনার দিক থেকে এইসব উপমা সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে সাধারণ। তবুও রবীন্দ্রকাব্য চেতনার মূলসূত্ররূপে এগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের চেতন প্রকৃতিচেতনা, তৃপ্তিকর সৌন্দর্যবোধ ও স্নিগ্ধ অনুভবের সরলার্থ যত সহজে এগুলোতে পাওয়া যায়, অন্যগুলোতে তেমনি নয়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার উপমা চয়নের ক্ষেত্রে কবিরস্বাধিকার শক্তি রয়েছে, সে হিসেবে চয়িত উপমাকে কৃত্রিম সৃষ্টি বলা অসমীচীন। কেননা উপমা কাব্যকলার কৌশল হলেও কি উপমা তিনি সৃষ্টি করবেন তা সম্পূর্ণই তাৎক্ষণিক ভাবনার ব্যাপার এবং মোটামুটি তা বিষয়রূপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবু কোন কোন উপমার প্রতি কবির স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে দুর্বলতার প্রশ্রয়ও দিয়ে থাকেন কবি। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপমা যে প্রকৃতিনির্ভর তা হয়তো নিগূঢ় প্রকৃতি চেতনার ফল, কিন্তু একটা কথা সত্য যে প্রকৃতি থেকে উপমা চয়নের স্বাভাবিক সুবিধা আছে। প্রকৃতি আমাদের এত ঘনীভূত পর্যায়ে যে তাকে বাদ দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ কেন, বাঙলা দেশের কবিদের পক্ষে এই প্রকৃতি-নির্ভরতা অনিবার্য।

রবীন্দ্রউপমার স্বরূপ

পূর্বভন কয়েকটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রউপমার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যদিও রবীন্দ্রউপমার স্বরূপ নির্ণয় পদ্ধতি যথাযথ ভাবে গৃহীত হয়নি। কাব্যধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা যে সব উপমার উল্লেখ আছে সেগুলোতে স্বরূপ নির্ণয়ের বিশেষ প্রচেষ্টা লক্ষীতব্য নয়, অবশ্য রবীন্দ্র-উপমায় কালিদাসের প্রভাব কিংবা প্রকৃতি সম্পর্কীয় আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীতাত্মক বা ভাবাত্মক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে আলোচনায় রবীন্দ্রউপমার মূল-স্বরূপকে খুঁজে পাওয়া যায় না গভীর অর্থে। সাম্প্রতিক আলোচনার লক্ষ্য রবীন্দ্র-উপমার মূল-স্বরূপ নির্ণয়। প্রসঙ্গে, আলোচনার সম্পূর্ণায়নের জন্য এবং রবীন্দ্রনাথের উপমার অন্য একটা দিক সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা সৃষ্টির জন্যও বটে, চিত্রোপমাগুলো সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। চিত্রোপমা বলতে যা বুঝি তা হচ্ছে ইমেজ, এ যুগের কাব্যবিদদের মতে ইমেজ কবিআত্মার গূঢ় সঙ্কেতনির্ভর। কাব্যালঙ্কার সব সময়েই কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নেবে এমন কোন সর্ত নেই, কিন্তু ইমেজে রয়েছে ইন্দ্রিয়বেদ্য অনুভূতি। অবশ্য ইমেজ শুধুমাত্র সাধারণ চিত্র নয়, ইন্দ্রিয়-চেতনার উদ্বোধক—দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদির। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার সাহিত্যের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা শরীর-নির্ভর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা নয়, কল্পনার সূক্ষ্মতায় তা কখনো কখনো ইন্দ্রিয়াতীত ব্যঞ্জনার জন্ম দেয়, শ্রুতি স্পর্শ ঘ্রাণ দৃশ্য সম্পৃক্ত অনুভূতির বাইরেও কবিচিত্ত নতুন অন্বেষায় ধাবিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় এই দিকটা লক্ষণীয় সন্দেহ নেই; কিন্তু নতুন পথ খুঁজে নেওয়া বিশেষ মানসিকতা, যা কবির আত্মবিকাশের সমতূল্য, তার মূলে আছে বাক-প্রতিমা বা ইমেজ। সমালোচক বলেন, 'ছন্দোলীলায় ও বাক্‌ব্যঞ্জনায় যদি কাব্যের প্রধান দুটি করণকৌশল বিধৃত বলে জানি, তা হলে এও দেখা

যাবে যে সে ব্যঞ্জনা কোন না কোন ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার রূপ নেয়। কবির মনোজগত মূলে ধ্বনি-স্পর্শ-ঘ্রান দৃশ্য সম্পৃক্ত অনুভুতিতে উদ্বুদ্ধ, sensuous, কবিচিত্ত ইন্দ্রিয়বেদী। শক্তিমান কবির আত্মবিকাশের পরিণত পর্যায়ে বাকব্যঞ্জনা ইন্দ্রিয়জ থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার অভিসারী, কিন্তু কখনোই মূল বিস্মৃত হয় না।'[৯] রবীন্দ্রনাথের বাকপ্রতিমা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে সমালোচকের উপরোক্ত উক্তি থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রোপমা বা ইমেজ 'ধ্বনি-স্পর্শ-ঘ্রাণ-দৃশ্য সম্পৃক্ত'। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়-নির্ভর উপমাগুলোকে সূত্রানুসারে সাজিয়ে এদের ভাব-প্রকৃতি নির্ণয় করা যেতে পারে।

দর্শনেন্দ্রীয়

১. রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর [মোহ : কড়ি ও কোমল]

২. লুকানো প্রাণের প্রেম পতিত সে কত !
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো। [ব্যক্তপ্রেম : মানসী]

৩. নিবিড় ঘন বনের রেখা
আকাশ শেষে যেতেছে দেখা
নিদ্রালস আঁখির পরে
ভুরুর মতো কালো। [অপেক্ষা : মানসী]

৪. নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধরো। [মানস সুন্দরী : সোনারতরী]

৫. অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। [সুখ : চিত্রা]

৬. গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো
জননী বক্ষের। [বন : চৈতালি]

৭. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হলো, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার। [বলাকা : বলাকা]

৮. পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি [শুভযোগ : মহুয়া]

৯. এ প্রশ্ন কি অনন্তকাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো।
[ছিন্নপত্র : পলাতকা]

১০. হাওয়ার মুখে ছুটলো ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল ছেঁড়া কয়েদি ডাকাতের মতো। । পৃথিবী : পত্রপুট]

শ্রবণেন্দ্রিয়

১. অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতোন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন। [সমুদ্র : কড়ি ও কোমল]

২. তীরের মতন পিপাসিত বেগে ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে রহিত, মর্মে রহিত ফুটিয়া। [প্রকাশ বেদনা : মানসী]

৩. কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরাণ মম
বিধাতার এক অর্থবিহীন
প্রলাপ বচন সম [উচ্ছৃঙ্খল : মানসী]

৪. লাবণ্য তরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস [নিষ্ফল প্রয়াস : মানসী]

৫. তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলু নদীর স্রোতের মতো। [তোমরা ও আমরা : সোনারতরী]

৬. অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহো সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্ত্রের মতো। [সমুদ্রের প্রতি : সোনারতরী]

৭. ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে, ব্যাপ্ত হয়ে যাক শূন্যময়
গানের তানের মতো। [জ্যোৎস্না রাতে : চিত্রা]

৮. এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত
এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুম রঞ্জিত
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে। [দুঃসময় : কল্পনা]

৯. ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অম্বররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি। [বলাকা : বলাকা]

১০. সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠলো যেন কেশরফোলা সিংহ
[পৃথিবী : পত্রপুট]

স্পর্শেন্দ্রিয়

১. আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
[যৌবন স্বপ্ন : কড়ি ও কোমল]

২. অধরের হাসি তব করিয়া চুম্বন
নয়নের দৃষ্টি তব নয়নে আঁকিয়া
কোমল পরশ খানি করিয়া বসন
রাখিয়া সর্বাঙ্গ নিশি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া। [হৃদয়ের ধন : কড়ি ও কোমল]

৩. ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিয়াছে
স্বপ্ন পাখীর পালকে। [ভৈরবী গান : মানসী]

৪. বিকচ সরস তনুর পরশ
কোমল প্রেমের মতো। [মায়া : মানসী]

৫. নগ্নবক্ষে বক্ষ দিয়া
অনন্ত রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।
তোমার হৃদয় কম্প অঙ্গুলীর মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত। [মানস সুন্দরী : সোনারতরী]

৬. সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিঘধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। [সুখ : চিত্রা]

৭. কুসুমের মতো খসি পড়িতেছ খসিখসি
মোর বক্ষপরে
গোপন শিশিরচ্ছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত করে। [গান : চৈতালি]

৮. পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণ মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে। [মদনভস্মের পর : কল্পনা]

৯. ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে। [দিঘি : খেয়া]

১০. প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা। [চুম্বন : কড়ি ও কোমল]

ঘ্রাণেন্দ্রিয়

১. উদাস নিঃশ্বাস-বায়ু বসন্ত সন্ধ্যায়
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকনা [বিবসনা : কড়ি ও কোমল]

২. গন্ধটুকু অন্ধকারে রেখার মত রাখি [অপেক্ষা : মানসী]

৩. আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার। [মানস সুন্দরী : সোনারতরী]

৪. আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনা বিভোল
নিশ্বাসের প্রায়—মৃদু ছন্দে দিব দোল
মৃদুমন্দ সমীরের মতো। [আবেদন : চিত্রা]

৫. আমার বিস্মৃত বেদনার আভাসটুকু
ঝরা ফুলের মৃদু গন্ধের মতো [তোমার অন্যযুগের সখা : পত্রপুট]

৬. এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা [গীতবিতান]

৭. যেতে যেতে পথ পাশে
পানা পুকুরের গন্ধ আসে
সেই গন্ধে পায় মন
বহু দিন রজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন। [ঘরছাড়া : সেঁজুতি]

৮. পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম। [৭ নং কবিতা : উৎসর্গ]

৯. পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজাল সম [পরিশোধ : কথা]

১০. তুমি ভাব, সেই রাত্রি দিন
চিহ্নহীন
মল্লিকা গন্ধের মতো
নির্বিশেষে গত। [ছায়া সঙ্গিনী : বিচিত্রিতা

চারটি ইন্দ্রিয়নির্ভর যে চল্লিশটি উপমার উদাহরণ দেওয়া হলো তাতে রবীন্দ্রনাথের বাগৈশ্বর্য বা ইমেজের ধারণা পরিষ্কার হয়। কবিতার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করে এইভাবে উপমা সংগ্রহ তথ্যনিবিষ্টতার গতানুগতিক পরিচয় সন্দেহ নেই এবং কারো কারো অভিযোগ থাকতে পারে এই পদ্ধতিতে কবিতার রসগ্রহণ সম্ভব নয়। কেননা মূল কবিতাতে উপমা সংস্থানের যে মূল্য আছে, কবিতা থেকে তুলে এনে সেই উপমার কাব্যিক আবহ খুঁজে পাওয়া দুরূহ বটে। কিন্তু আমাদের আলোচনা যখন কবিভাষা সম্পর্কিত তখন এই পদ্ধতির আশ্রয়ী না হয়ে উপায় নেই এবং যতখানি পারা যায় কবি-ভাষা বিশ্লেষণে বাক-ব্যঞ্জনায় কবি-আত্মার নিগূঢ় অনুভবকে প্রকাশ করাই লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের উপমাগুলোর মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সংবেদনা প্রধানতঃ দেখার মধ্য দিয়ে এসেছে অর্থাৎ দৃশ্য জগতকেই তিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করেছেন; প্রাগুক্ত অধিকাংশ উদাহরণই এর প্রমাণ দেবে। এজন্যে রবীন্দ্র-উপমাতে চিত্রধর্ম অঙ্গীকৃত হয়েছে। কিন্তু শুধু মাত্র চিত্রের মধ্যেই যদি তাদের সার্থকতা স্পষ্ট হতো তাহলে কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্র-

নাথের কোন পার্থক্য থাকতো না। রবীন্দ্রনাথের চিত্ররূপময় ইমেজ কখনো ধ্বনিরূপ নিয়ে বা স্পর্শের কোমলতা নিয়ে আসে; কিংবা উল্টোটাও হয়, ধ্বনি দৃশ্যরূপ নেয় বা ঘ্রাণ স্পর্শায়িত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় নির্ভর উদ্ধৃত শেষ উপমা 'সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠলো যেন কেশর ফোলা সিংহ'তে ধ্বনি চিত্ররূপ নিয়েছে। স্পর্শনেন্দ্রিয়ের আট সংখ্যক উপমা একটি সুঠম ইমেজ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে—পুষ্প সুবাসের স্পর্শ হৃদয়কে লতার মতো জড়িয়েছে, এখানে ঘ্রাণজগৎ স্পর্শজগৎ এবং দৃষ্টিজগৎ সবজগতই যেন একীভূত হয়ে গেছে। ওরই নয় সংখ্যক উপমায় দেখি দিঘির জলে ডুবানো শরীর স্পর্শসুখ এনেছে, কিন্তু শরীরউপমিত হয়েছে ঘটের সঙ্গে। অর্থাৎ স্পর্শজগৎ থেকে দৃষ্টিজগতে কবিকল্পনার বিচরণ হয়েছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের চার সংখ্যক উপমাতে বনের গন্ধ বাসনা বিভোল নিশ্বাসের স্পর্শে রূপায়িত হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রকাব্যে ইমেজ একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ে স্থিতিধর্মী নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েও তার বিস্তার আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের উপমা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-নির্ভর এ কথা বলা আমাদের লক্ষ্য নয়। 'বক্রশীর্ণ পত্রখানি দূর গ্রাম হতে/ শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে/তৃষার্ত জিহ্বার মতো'[২০]—এ উপমা রবীন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট চিত্রধর্মী উপমা, উপমেয় উপমানে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-জগতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; দুটোই চিত্রাত্মক, কালিদাসের উপমার যা প্রধান বৈশিষ্ট্যও বটে। রবীন্দ্রকাব্যে এ শ্রেণীর উপমা অনেক আছে এ কথা সত্য হিসেবে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রউপমার যে ভাবগূঢ় সংকেত তা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়ে সব সময় আসে না। এ জন্যে উপমেয় উপমানের যে কোন একটিকে, কখনো কখনো উভয়কে আমরা ইন্দ্রিয়াতীত ভাববস্তুরূপে পাই। দর্শনেন্দ্রিয়ের ছয় সংখ্যক উপমাটি পুনরুক্ত করা হচ্ছে ব্যাপারটি বোঝবার জন্যে,

গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো
জননী বক্ষের।

এখানে উপমেয় 'নিস্তব্ধতা' ইন্দ্রিয়াতীত, উপমান 'অঞ্চল' ইন্দ্রিয়নির্ভর, উপমেয় উপমানের সম্মিলনে একটি ভাবানুভূতির জন্ম। এ শ্রেণীর উপমার রূপলক্ষণ হচ্ছে অমূর্তকে মূর্ত দিয়ে বা অসীমকে সীমা দিয়ে বোঝাবার প্রেরণা। একই প্রকৃতির আরো কয়েকটি উপমা,

১. দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালোবাসা [সিন্ধুতরঙ্গে : মানসী]

২. বাজিতে লাগিল হৃদয় পরাণ
বীণা ঝংকার সম। [পুরস্কার : সোনারতরী]

৩. ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে, ব্যাপ্ত হয়ে যাক শূন্যময়
গানের তানের মতো। [জ্যোৎস্নারাতে : চিত্রা]

আরেক শ্রেণীর উপমা আছে যেগুলি ঠিক উল্টোপ্রকৃতির অর্থাৎ এ উপমা-গুলোতে মূর্তকে অমূর্তে, সীমাকে অসীমে, বস্তুকে ভাবে লীন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে উপমেয় ইন্দ্রিয়নির্ভর, উপমান ইন্দ্রিয়াতীত। 'চঞ্চল আলো আশার মতো কাঁপিছে জলে, (নিরুদ্দেশ যাত্রা : সোনারতরী) এ প্রকৃতির উপমা। নিম্ন উপমাগুলোও একই লক্ষণজাত,

১. বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি। [বিজয়িনী : চিত্রা]

২. এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন লতিকায়

ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরণ হৃদয়-ব্যথার মতো।
[আবার : বলাকা]

৩. সেই আলোটি নিমেষ হত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে।
[গীতবিতান]

উদ্ধৃতি প্রচুর দেওয়া যেতে পারে, আপাততঃ তার প্রয়োজন নেই, শুধু রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য লক্ষণজাত উপমাগুলোর প্রকৃতি বোঝবার জন্য উদ্ধৃতির উল্লেখ। দেখা গেল রবীন্দ্র-উপমায় ইন্দ্রিয়াতীততা দুইই রয়েছে উপমেয় উপমানের ক্ষেত্রে। দুই বিপরীতকে সঙ্ঘবদ্ধকরণ শুধু নয়, এমন সব অভিজ্ঞতাকে উপমেয় উপমানে স্থান দেওয়া হয়েছে যা আমাদের হৃদয়ের পরতে পরতে কাজ করে যায়, সৃষ্টি করে কিছু ব্যাকুলতা, কিছু ভয়, কিছু শিহরণ। রবীন্দ্রনাথের উপমাগুলো, বিশেষতঃ যেখানে বস্তুকে ভাব দিয়ে অর্থাৎ মূর্তকে অমূর্ত দিয়ে উপলব্ধির চেষ্টা হয়েছে, প্রকৃত সার্থকতা অর্জন করেছে। কেননা, সেখানে সীমার বাঁধন আর থাকেনা, অসীমের স্বরূপ প্রমূর্ত হয়। জানাকে অজানা দিয়ে, প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ দিয়ে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিতে রয়েছে ভাব হতে রূপে বা রূপ হতে ভাবের আসা যাওয়ার চক্রপথের ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতই সীমা অসীমের তত্ত্বকে স্পষ্ট করে। রবীন্দ্র-উপমার এই বিশেষ প্রকৃতি যে তাঁর কবিস্বভাব সম্মত এ কথা অস্বীকার করার মতো নয়, কিন্তু এ ছাড়াও এমন উপমা রবীন্দ্রকাব্যে আছে যাতে ইন্দ্রিয় নির্ভরতা বলতে কিছু নেই।

কমল ফুল বিমল শেজখানি
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা

মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা
[নিদ্রিতা : সোনারতরী]

'সুখের মতো ব্যাথা' উপমা হিসেবে অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। গভীরতম বিচারে বোঝা যায় এখানে সব অভিজ্ঞতা সংহত হয়ে গেছে। সেই সুপ্ত রাজপুরীতে প্রদীপের মৃদু আলোর আভায় ঘুমনিঝুম রাজকুমারীর কোমল তনুলতা দেখে রাজকুমারের প্রাণে অতিরিক্ত সহানুভূতি জেগেছে, এ অতিরিক্ততা থেকেই ব্যথা, অতি আনন্দে অশ্রুবারি যেমন ঝরে। কোথায়ও উপমা হয়তো ব্যাখ্যাধর্মী, কিন্তু ভাবনিষ্ঠ তন্ময়তা ও রহস্যময়তা আচ্ছন্ন। ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার কোন অতলে এর কার্যকারিতা তা ব্যাখ্যার অতীত। এ শ্রেণীর উপমায় শুধু স্মৃতি, শুধু অনুষঙ্গ জাগ্রত। যেমন,

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা। [নিষ্ফল কামনা : মানসী]

আরেকটি উপমা,

কি তোমারে চাহি বুঝাইতে ?
গভীর হৃদয় মাঝে
নাহি জানি কি যে বাজে
নিশিদিন নীরব সংগীতে—
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন। [দুর্বোধ : সোনারতরী]

উপমাটাই যেন নিস্তব্ধতার অনুষঙ্গ-নির্ভর। শুধু উপমেয়-উপমান বিচার্য নয়, যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সে গুলোও যেন সমাহিত ধ্যান কল্পনা বোধের জন্ম দেয়। প্রখর শ্রবনেন্দ্রিয়ও, 'নীরব সংগীত' আর, 'রজনীর ধ্বনি'র মধ্যে কোন শ্রুতিগত ব্যাপার আবিষ্কার করতে পারবে না। রজনীর আবার কি রকম ধ্বনি? এটা দেখার তো নয়ই, স্পর্শের নয় শ্রুতিরও নয়, শুধু অনুভবের। ঘনযামিনীর নিশ্চুপ নিচ্ছিদ্র নীরবতা হয়তো বা কবিহৃদয়ের ধ্বনির প্রতীতি এনেছে, কিন্তু সেকি কানে শোনার? অনুভূতির কি পরিমাণ প্রাখর্য থাকলে এ জাতীয় উপমা সৃষ্টি সম্ভব তা ভাববার মতো। শ্রেষ্ঠ উপমাশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এইখানে। এখানেই তাঁর রোমান্টিকতা ও ইঙ্গিত-ময়তা। সংখ্যা হিসাবে অবশ্য এ শ্রেণীর উপমা রবীন্দ্রকাব্যে মুষ্টিমেয়, কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই এ সব উপমা রোমান্টিকতার চূড়ান্ত রূপ, সব প্রত্যক্ষতাকে অতিক্রম করার এক উচ্চকিত উল্লাস, এক বাচ্যাতিরিক্ত আবেগের ঘনতীব্র উপলব্ধির স্বাক্ষর। এ উপলব্ধির গভীরতা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো উপমাশিল্পীর পক্ষে বলা সম্ভব,

তুমি সুদূরের দূতী নতুন এসেছ নীলমণি
স্বচ্ছ নীলাম্বর সব নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।

[নীলমণিলতা : বনবাণী]

উপমার কি বিপুল বিস্তার! রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙলা সাহিত্যে এ উপমা সৃষ্টির কথাই আসে না। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক প্রতি-ভূদের মতো উপমায় যে গভীরতা ও বিস্তৃতি এনেছেন তাতে সর্বদিক থেকে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে এবং একই বৈশিষ্ট্যবিচারে রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ উপমাশিল্পী হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু উপমাশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এখানেই শেষ নয়, আরো আছে।

রবীন্দ্রনাথের উপমা বিশ্লেষণে বুদ্ধদেব বসু একটি সুন্দর কথা বলেছেন

তাঁর এক প্রবন্ধে, "উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প এমনকি প্রতীক—এই সবগুলোই উপমার অভিজ্ঞানের মধ্যে ধরে নিতে হবে, শুধু মতো থাকলেই উপমা হলো তা নয়; ভাব যেখানে ছবি হয়ে উঠছে, চিন্তা যেখানে স্পর্শসহ রূপ নিল সেখানেই—কোন না কোন, সূক্ষ্ম, চতুর, লুক্কায়িত উপায়ে উপমার ব্যবহার অনিবার্য"[২১] রবীন্দ্রকাব্যে এই লুক্কায়িত উপমার সংখ্যা যে কত তা আর হিসেব করে বলা যাবে না। কবিতার শরীরে এগুলো লতায় পাতায় এমনি জড়িয়ে আছে যে তুলে এনে সেগুলোর বিচারবিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়, কারণ এগুলো সাধারণ উপমা নয় যে। সেই বিখ্যাত চরণ,

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।

[অশেষ : কল্পনা]

এখানে উপমেয় উপমান বা সাধারণ ধর্মের কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না সন্ধ্যার মধ্যে মানবিক চেতনার আরোপ হয়েছে অর্থাৎ সন্ধ্যা উপমিত হয়েছে একটি নারীমূর্তির সঙ্গে। মানবিক চেতনা সমৃদ্ধ দৃশ্যরূপ কোন আরোপিত আলঙ্কারিক করণ-কৌশল নয়, কবি-চিত্তে আবেগ সংস্থানের স্বাভাবিকতা থেকে এর সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের আগে জড়জীবনে কোন কবি মানবিক চেতনা আনেননি একথা আমরা বলছিনে, অনেক কবিই 'সন্ধ্যা-বধূ' কথাটি ব্যবহার করছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই উপমায় শুধু শক্তি নয়, শুধু কল্পনা নয়, আবেগ ও চিন্তার এমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ আছে যে প্রয়োগ কর্মে তার অনিবার্যতা কবির দ্বারাও সানন্দে অনুসৃত হয়েছে।[২২] আরো বলতে হয় এ ধরণের উপমায় উপমার কোন স্পষ্ট রূপ নেই, আছে ইঙ্গিতটুকু। উপমা তৈরীর এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক, রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কোন কবির কাব্যে তা লক্ষিত নয়। প্রাচীন উপমাগুলো অলঙ্কার সূত্রের সব নিয়ম পালন করলেও অদ্যতন বিচারে সেগুলো অত্যন্ত স্থূল, সেখানে ইঙ্গিতধর্মিতার কথাই আসে না, বরং আলঙ্কারিক কারণকৌশলে উপমেয়

উপমানে যথাযথ সাযুজ্য রক্ষা করে উপমাকে কতখানি সুন্দর করা যায় তার প্রচেষ্টা গতানুগতিক পদ্ধতিগত রূপ নিতে সদা তৎপর। রবীন্দ্রনাথের উপমা সেদিক থেকে ভিন্নধর্মী, ইঙ্গিতের তীক্ষ্ণতায় বাঙলা কাব্যে নবত্ব সূচক। যে মানবিক চেতনার কথা বলা হয়েছে তার একটা কাব্যিক মূল অবশ্যই আছে, কেননা, 'এর ফলে উদ্দিষ্ট অলঙ্কার আমাদের সাহিত্যভূমির এক স্বাধীন সজীব নাগরিক হয়ে ওঠে, 'শো-কেসের' সযত্নরক্ষিত পুত্তলিকা মাত্র থাকে না।'[২৩] জীবন্ত উপমার আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, শুধু প্রমাণের জন্য রবীন্দ্রনাথের বাকব্যঞ্জনা কতখানি প্রখর—

১. ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে [পত্রের প্রত্যাশা : মানসী]

২. সন্ধ্যা নত আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে [নিষ্ফল কামনা : মানসী]

৩. দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যত বাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বজ্রহাসি শূন্যে বরষিয়া [মেঘদূত : মানসী

৪. বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেনী [একাল ও সেকাল : মানসী]

৫. শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে [যেতে নাহি দিব : সোনারতরী]

৬. বহু বন গন্ধ বহে
অকস্মাৎ শান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
মৃদু সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহু পাশে। [বিজয়িনী : চিত্রা]

৭. রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকা রাশি সূচি বিঁধে চোখে।
[বসুন্ধরা : সোনারতরী]

৮ উর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইংগিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া।
[দুঃসময় : কল্পনা]

৯. মুহূর্তের পরে
লজ্জা আসি করি দিল দ্রুত পদাঘাত
দৃপ্ত রোষ স্পর্শিরে। [নরক বাস : কাহিনী]

০. পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ [বলাকা : বলাকা]

সবগুলো উদ্ধৃতিতেই উপমেয় উপমান, সাধারণ ইত্যাদি আলঙ্কারিক উপমার মূল উপকরণ গুলো অনুপস্থিত, সে জন্যে আপাত বিচারে এগুলোকে উপমা বলা হয়তো বা দুঃসাহসের পরিচয়, কিন্তু গভীরতম বিশ্লেষণে দেখা যাবে এইসব উপমায় উপমেয়-উপমান পরস্পর বিলীন হয়ে গেছে। এবং সে জন্য উপমেয় উপমান নির্ণয় দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু তার দরকারও নেই। কেননা এইসব উপমার ভাষাও আলাদা, অনুষঙ্গও আলাদা এবং কার্যকারিতাও উপমেয়-উপমানে সীমাবদ্ধ নয়, এগুলোকে অতিক্রম করে অন্য কোন অভিধায় স্বরূপায়িত। সে হিসেবে এগুলো প্রত্যেকটি 'অবগুণ্ঠিত উপমা' এবং এই 'অবগুণ্ঠিত উপমা' রবীন্দ্রকাব্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে, কাব্যদেহে সেগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমালোচকের ভাষায় বলতে হয়, "কাব্যের দেহ থেকে তাঁর উপমাকে বিছিন্ন করা যায় না, তা প্রবিষ্ট হয়ে থাকে পরতে পরতে, কাজ করে যায় গোপনে, ফলিয়ে তোলে তাঁর অনুভূতিগুলোকে তাঁর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বোধ ও আনন্দ বেদনাকে।"[২৪] রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তা বর্ণনার ভঙ্গিতে হলেও ভাবনার গূঢ়তর রসব্যঞ্জিত, উপলব্ধির গভীরতায় অতলস্পর্শী। সে জন্যে তাঁর উপমার সৌন্দর্য, তাঁর কবিতার মতোই, ভাবেও যেমন, ভাষাও তেমন,—ভাব এ ভাষার সমবায়ে যে সাঙ্গীতিক আকুলতার জন্ম সেখানেই রবীন্দ্রউপমার কাব্যিক সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

সূত্রাবলী

১. উন্মাদিনী কালী-কল্পনা আছে। যেমন—ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর। নৃত্য হোক তবে।

২. জগন্নাথ চক্রবর্তী,—প্রতীকের প্রয়োগ। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বান্দাপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস ; ১ম. সং,—জুন. ১৯৬৫, কলিকাতা, পৃ ১৯২।

৩. প্রবোধচন্দ্র সেন ;—রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কালিদাস। পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রায়ণ (১ম খণ্ড) বৈশাখ ১৩৬৮, কলিকাতা, পৃ ৯০।

৪. শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'ত্রয়ী' (২য় সং, ১৩৬৭, কলিকাতা) গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৫. মেঘদূত, প্রাচীন সাহিত্য—সংকলন, পুনরমুদ্রণ পৌষ, ১৩৬০, পৃ ৭৮।

৬. স্বপ্ন ঃ কল্পনা।

৭. উত্তরমেঘ ৬৬। বুদ্ধদেব বসু ; কালিদাসের মেঘদূত, ৩য় সং, চৈত্র ১৩৬৯, কলিকাতা ; পৃ ১০৬।

৮. উত্তরমেঘ ৯২। প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬।

৯. বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭।

১০. মহাস্বপ্ন ঃ প্রভাত সংগীত।

১১. পূর্বমেঘ ৫৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।

১২. বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১।

১৩. পূর্বমেঘ ২৯। প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮।

১৪. বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯।

১৫. উত্তরমেঘ ৯৩। প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬।

১৬. বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭।

১৭. ছিন্নপত্র - সংকলন, পূর্বোক্ত, পৃ ২২০।

১৮. শশিভূষণ দাশ গুপ্ত ; উপমা কালিদাসস্য, নব সং, ১৩৬৩, কলিকাতা ; পৃ ৫৪।

১৯. অমলেন্দু বসু ; 'সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা'। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রায়ণ (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৪।

২০. সুখ : চিত্রা।

২১. রবীন্দ্রনাথের উপমা, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ, ১ম সং, মাঘ ১৩৬৯ কলিকাতা পৃ ১৯৭।

২২. নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, তার
সোনার কবরী খসা একটি কুসুমে
তোমায় সাজাব কবে সম্পূর্ণ দিনের শেষে প্রিয়া
পরিচ্ছন্ন ঘুমে।
: বিষ্ণু দে—অক্টোবরের দিনগুলি ;
নাম রেখেছি কোমল গান্ধার,
২য় সং ১৩৬৬, কলিকাতা ; পৃ ৬১।

২৩. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা কবিতার নবজন্ম, ১ম সং, পৃঃ ৫১৯।

২৪. বুদ্ধদেব বসু ; রবীন্দ্রনাথের উপমা, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৮